Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 142–151
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

লবণ শ্রমিকদের জীবনসংগ্রামের অকথিত অন্তর্বয়ন : প্রসঙ্গ 'লবণাক্ত' উপন্যাস

যাদব মুরারী
শিক্ষক, নাটাগড় স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সমিতি বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)
ইমেল : jammm8419@gmail.com

Keyword
লবণ শ্রমিক, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ত্রিভুবন, কচ্ছের রণ, ব্রিটিশ, আজাদ, লবণ কর।

Abstract
জলই জীবন। এই জল থেকে সৃষ্ট লবণ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে জলের পরেই তার স্থান। এই লবণ ছাড়া সব খাবারই স্বাদহীন। আবার লবণ মানব শরীরে আয়োডিনের জোগান দেয়। তাই লবণ আমাদের জীবন ধারার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। অথচ অতিপ্রয়োজনীয় এই লবণ উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কোন খোঁজ খবর আমরা কোনদিন রাখিনা। সমাজসচেতন প্রশাসক, নিম্নবর্গ শ্রেণির সমীক্ষক ও প্রখ্যাত কথাকার অনিতা অগ্নিহোত্রী গুজরাট রাজ্যের কচ্ছের রণ অঞ্চলের লবণ শ্রমিকদের দুর্বিষহ জীবনের কথা ঐতিহাসিক পটভূমিতে তুলে ধরেছেন 'লবণাক্ত' (২০২২) উপন্যাসে। দুই কালপর্বের ঘটনাবৃত্ত— এক ব্রিটিশ শাসনকাল, অপরটি বর্তমান সময়; এই দুই সময়ের লবণ শ্রমিকদের জীবনযুদ্ধের নানান খুঁটিনাটি তথ্য উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। স্বাধীনতাপূর্ব কালে বিষ্ণুরাম, মালতী, উমেশ, গনেশদের লবণ উৎপাদনের অনেক আগে থেকেই কোলি, মিয়ানা, সান্ধি গোষ্ঠীর আগারিয়ারা রণ অঞ্চলে এ কাজ করতো। রণ অঞ্চলে কূপ খনন করে যে জল উত্তোলন করা হত তা সমুদ্রের জলের চেয়ে প্রায় ছয় গুণ বেশি লবণাক্ত ছিল। পূর্বপুরুষদের ও তাদের প্রতিবেশীদের পেশা অনুসরণ করে ত্রিভুবন আগারিয়ারা ব্রিটিশ ভারতে লবণ চাষে নিযুক্ত ছিল। এই চাষ করে তারা খুব স্বচ্ছলভাবে না হলেও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ব্রিটিশদের ছলচাতুরতায় নিষ্কর লবণ উৎপাদনের উপর কর ব্যবস্থা চালু হলে শ্রমিকদের জীবনে নেমে এসেছে ঘোর অন্ধকার। ফলে খারাগোড়ার মত লবণ গ্রামে মালতী-বিষ্ণুরামদের পরিবার অনটনের আবর্তে ঢাকা পড়ে যায়। গুজরাটের সুরেন্দ্রনগর জেলার বিভিন্ন অঞ্চল লবণ চাষের আদর্শ ভূমি। এই অঞ্চলে বাইরে থেকে বহু পরিযায়ী শ্রমিক লবণ চাষ করতে আসত। কালক্রমে তারা পুরোপুরি এই পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। যখনই ব্রিটিশরা ব্যবসায়িক মনোভাবের সঙ্গে শাসক মনোভাব যুক্ত করেছে তখনই তারা অর্থ লোলুপতার খেলায় মেতে উঠেছে। লবণ আইনের মত জঘন্য একটি আইন কার্যকর করে ব্রিটিশরা লবণ চাষের একচ্ছত্র অধিকার গ্রহণ করে নিয়েছে নিজেদের হাতে। এর পরিণাম হয়েছে ভয়ানক; সাধারণ লবণ শ্রমিকরা লবণ চাষ করে উপযুক্ত পারিশ্রমিক বা মূল্য কোনটাই না পেলেও কর প্রদান করতে বাধ্য থাকত শাসকের কাছে। এমনকি এই আইন মোতাবেক ব্রিটিশরা ছাড়া অন্য কেউ লবণ চাষ করতে পারবে না। গান্ধীজির নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন হলে

ত্রিভুবনের মত বহু লবণ শ্রমিক নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। বছরের আট মাস নির্মমভাবে কায়িক পরিশ্রম করে আগারিয়ারা লবণ উৎপাদন করলেও কালক্রমে তাদের অধিকার লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। একবিংশ শতকের বর্তমান সময়ে লবণ শ্রমিকদের দুর্দশার কথা আজাদরা উপলব্ধি করেছে ঠাকুরদা ত্রিভুবন, পিতা রাম সিং-এর দুর্বিষহ জীবনের পুনরাবৃত্তিতে। বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক অনিতা অগ্নিহোত্রী 'লবণাক্ত' (২০২২) উপন্যাসে গুজরাটের ডান্ডির সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভাবনার অবতারণা করলেও এর পশ্চাতে তুলে ধরেছেন বর্তমান ও অতীতের লবণ শ্রমিকদের জীবনযন্ত্রণার নির্মম কাহিনি।

Discussion

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ। এই চর্যাপদে বৌদ্ধ সহজিয়াদের ধর্মকথা প্রাধান্য পেলেও সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রণার কথাকে চর্যাকাররা এড়াতে পারেননি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সামাজিক ইতিহাস প্রণয়ন না হলেও সাহিত্য যেহেতু জীবন নির্ভর তাই সাহিত্যের মধ্যে জীবননদীর স্রোত বয়ে চলে চিরন্তন বাস্তবতায়। আর এ জন্যই সাহিত্যের মধ্যে ইতিহাসের বহু অজানা তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। মানুষ সামাজিক জীব। ফলে সাহিত্যের আঙ্গিনাকে মানবজীবনের বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবেই গড়ে তোলেন সাহিত্যিকরা। যেকোন ভাষার সাহিত্য সৃষ্টির প্রারম্ভকাল থেকেই এই ধারা চলে আসছে। মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার চিত্র সাহিত্যের পাতাকে সমৃদ্ধ করেছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে আন্তনিও গ্রামশির প্রান্তিক মানুষের ধারণাকে সার্বজনীন করতে বহু গবেষক 'সাবলটার্ন' শব্দটির সার্থক প্রয়োগ দেখিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রণজিৎ গুহ, গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে, গায়েত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক প্রমুখ গবেষকগণ 'সাবলটার্ন' চর্চার ক্ষেত্রটিকে আরও বৃহত্তর পরিবেশে প্রসার ঘটিয়েছেন। দশম-দ্বাদশ শতকে চর্যাকাররা সাহিত্য সাধনায় নিবিষ্ট না থাকলেও নিজেদের ধর্মীয় সাধনার কথা বলতে গিয়ে নিরন্ন মানুষের জীবনকথাকে অস্বীকার করতে পারেননি। রণজিৎ গুহ, গৌতম ভদ্রদের ভাবনার প্রায় হাজার বছর পূর্বে চর্যাকারদের পদে উঠে এসেছে প্রান্তিক মানুষের জীবনচর্যা। চর্যাপদের ৩৩ নং পদে ঢেণ্ঢন পাদের কথায়—-

> "টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
> হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী।।"[১]

চর্যাপদে বর্ণিত নিম্নবর্গ বা প্রান্তিক মানুষগুলি বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের প্রান্তভূমিতে বসবাস করলেও এবং শত অনটনেও আত্মীয়-স্বজনের আনাগোনা লেগেই থাকত। আপাতদৃষ্টিতে তাদের আত্মীয়তা ও আন্তরিকতার মনোভাব অভাব-অনটনকে জয় করেছে। আসলে ব্যাধ, চন্ডাল, শুঁড়ি, সূত্রধার প্রভৃতি বৃত্তিনির্ভর মানুষগুলির দুর্বিষহ জীবনের চালচিত্রই এখানে উপজীব্য।

'নিম্নবর্গ' বা 'প্রান্তিক' এই ধারণাটি বর্তমানে একটি বৃহৎ ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। এই নিম্নবর্গের মধ্যে শ্রমিক, কৃষক, মজুর শ্রেণির মানুষ অন্তর্ভুক্ত। এরা অনন্তকাল ধরে অবহেলিত, বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত হয়ে আসছে। কিন্তু এদেরই কর্মপ্রক্রিয়ায় সমাজচক্র গতিশীল। অথচ এদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার শেষ নেই। এদের পরিশ্রমই সমাজের সকল মানুষের চলার পথকে সুগম করে। মধ্যযুগের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে দৈবনির্ভর যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে তার মধ্যে মঙ্গলকাব্য উল্লেখযোগ্য। চর্যাপদের পর বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে প্রান্তিক মানুষের ধারণাটি প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। চন্ডীমঙ্গলে কালকেতুর ব্যাধ জীবন, মনসামঙ্গলে জালু-মালুর জেলে জীবন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ফলে তারা সহজেই কোন না দেবদেবীর শরণাপন্ন হয়েছে খুব স্বাভাবিকভাবে। মঙ্গলকাব্য ধারায় সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সওদাগর বা বণিকের সামাজিক অবস্থান অনেক উন্নত ছিল। তবুও কালকেতুদের মত নিম্নবর্গের মানুষের দৈনন্দিন অনটনের চিত্র ধর্মীয় ভাবাপন্ন কবিদের চোখ এড়ায়নি।

মধ্যযুগের প্রান্তিক মানুষের সবচেয়ে আদর্শ দৃষ্টান্ত হতে পারেন 'শিবায়ন' কাব্যের শিব চরিত্র। শিবের দুঃখ ও দারিদ্রের কাহিনী কোন পৌরাণিক চরিত্রের চারিত্রিক স্খলন নয়; প্রকৃতপক্ষে তিনি কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের ব্রাত্য শ্রেণির প্রধান প্রতিভূ হয়েছেন। অলৌকিকতার আদল ভেঙ্গে শিব নেমে এসেছেন বাস্তবের ভূমিতে; যেখানে শোষিত, নিঃস্ব, ভূমিহীন কৃষিজীবী

মানুষ জীবনসংগ্রামে অনবরত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সর্বহারা শিব সংসারের অনটন ঘোচানোর জন্য চাষের সরঞ্জাম জোগাড়ের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, শিবায়ন, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যের কবিরা জীবনরূপের রূপকার। তাঁদের সৃষ্টিতে গণচেতনার যথার্থতা পরিস্ফুট হয়েছে দুঃখ-দারিদ্রপূর্ণ জীবন নির্মম ও কঠোর বাস্তবতায়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্রপূর্ণ রচনায় প্রান্তিক মানুষের কথা অবলীলায় সাহিত্যরূপ পেয়েছে। 'নীলদর্পণ', 'জমিদারদর্পণ', 'পল্লিগ্রামদর্পণ' প্রভৃতি নাটকে ঊনবিংশ শতকের ইংরেজ শাসন ও শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষের জলন্ত দর্পণের চিত্র উদ্ভাসিত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের বিষয় ব্রিটিশ ভারতে কৃষকদের নির্মম অত্যাচারিতের কাহিনি। ভাববাদী দার্শনিকতায় পুষ্ট হলেও রবীন্দ্রনাথের বহু রচনাতেই নিম্নবিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। শৈশবেই এই মানুষগুলির প্রতি লেখকের সহানুভূতি 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে জগমোহনের স্নেহধন্য নিম্নবর্গীয় মুসলিম সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়। 'ঘরে বাইরে'-তেও পঞ্চুর মত নিরন্ন প্রজার পরিচয় মেলে। আবার 'ত্যাগ' ও 'শাস্তি' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভিন্ন ধরণের অনটনের চিত্র অঙ্কন করে গল্প দুটির তাৎপর্য অনেকটাই বৃদ্ধি করেছেন।

বঞ্চিত, শোষিত ও লাঞ্ছিত মানুষের শেষ অস্ত্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছে কৃষক, মজুরদের সম্মিলিত গণআন্দোলন। সমাজসচেতন সাহিত্যিকদের লেখনীতে সাহিত্যের আঙ্গিনায় ভীড় করেছে এই কৃষক, মজুররা। এরা কখনো এসেছে নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই-এর ব্যাটন নিয়ে; আবার কখনো প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গড়তে না পেরে নিষ্পেষিত হয়েছে শাসকের শাসনযন্ত্রে। বিশ শতকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, মনীশ ঘটক, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, সুবোধ ঘোষ, সোহরাব হোসেন, সতীনাথ ভাদুড়ী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাশ্বেতা দেবী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, অমিয়ভূষণ মজুমদার, গুণময় মান্না, প্রফুল্ল রায়, অভিজিৎ সেন, সমরেশ বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকের সাহিত্যে উঠে এসেছে প্রান্তিক মানুষের জীবনযন্ত্রণার নানান বেদনার্ত কাহিনি। একবিংশ শতকের খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিকগণ এই ধারাকে আরও সমৃদ্ধ ও মননশীল করে চলেছেন নিরন্তর। এই ধারার উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র, সাধন চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সৈকত রক্ষিত, নলিনী বেরা, দেবর্ষী সারোগী, সাত্যকী হালদার, সমরেশ মজুমদার, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অনিতা অগ্নিহোত্রী প্রমুখ। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রান্তিক মানুষের জীবনসংগ্রামের ধারা নিয়ে সাহিত্য সম্ভারকে প্রতিনিয়ত ঢেলে সাজাচ্ছেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিণী বাঙালি সাহিত্যিক অনিতা অগ্নিহোত্রী মাত্র ২৫ বছর বয়সে ভারত সরকারের উচ্চ পদস্থ আমলা পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় জন্মগ্রহণ করলেও বৈবাহিক সূত্রে পিতৃ পদবি 'চট্টোপাধ্যায়' মুছে দিয়ে মারাঠী স্বামীর 'অগ্নিহোত্রী' পদবি গ্রহন করেন। তাঁর শিক্ষাজীবন কলকাতাতেই শুরু কলকাতাতেই শেষ। তিনি তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক হন। তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮০ সালে প্রশাসনিক কাজে ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার জন্য ওড়িশায় নিযুক্ত হন। এই সময়েই অনিতা তাঁর সহপাঠী মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা সতীশ অগ্নিহোত্রীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। শৈশবকাল থেকেই তিনি লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিমল করের লেখা তাঁকে অনুপ্রাণিত করত। এমনকি বিমল কর অনিতাকে সাহিত্য চর্চায় ভীষণভাবে উৎসাহিত করতেন। অনিতা এক সময় জনপ্রিয় শিশুপত্রিকা 'সন্দেশ'-এর নিয়মিত লেখক হয়ে উঠেছিলেন। কৈশোর জীবনে এই নিয়মিত সাহিত্য চর্চা তাঁকে অফুরন্ত সাহস জোগায় এবং সাহিত্যের বৃহৎ ক্ষেত্রে পদার্পণের জায়গা করে দেয়। অনিতা অগ্নিহোত্রী বাঙালি হলেও তিনি সাহিত্য চর্চার উপাদান, চরিত্র এবং পটভূমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাংলার বাইরের কোন স্থানকে নিয়ে গড়ে তুলেছেন। কর্মসূত্রে প্রশাসনের কাজে গিয়ে ছোটনাগপুর, সম্বলপুর, সুন্দরগড়, কালাহান্ডি, কোরাপুট, হাজারিবাগ, মারাঠাওয়াড়া, চেরমো প্রভৃতি স্থানের মানুষের দুর্বিষহ জীবনযন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখেছেন। তাঁর সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে সাহিত্যের পাতায়।

আই.এ.এস পদাধিকারী অনিতার শিক্ষাগত বিষয় অর্থনীতি। তাই খেটে-খাওয়া মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক কাঠামোটিকে তাঁর বিষয়ের সঙ্গে সম্ভবত একাত্ম করে দিয়েছেন। মানুষের জীবন ও জীবিকার টানাপোড়েন দেখাতে গিয়ে তাঁর শিল্পী সত্তার আসল পরিচয় দিয়েছেন বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসে। অনিতার উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলনগুলি হল--- 'চন্দনরেখা' (১৯৯৩), 'প্রতিক্ষণ' (১৯৯৭), 'তরণী' (২০০০), 'অতলস্পর্শ' (২০০৬), 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প' (২০১৮) প্রভৃতি। কিশোর সাহিত্যিক হিসেবেও অনিতা জনপ্রিয় স্থান দখল করে রয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিশু-কিশোর সাহিত্যগুলি হল 'আকিম ও পরিকন্যে' (১৯৯৩), 'জয়রামের সিন্দুক' (১৯৯৩), 'এবু গোগো' (২০০৯), 'ছোটদের গল্পসমগ্র' (২০১২), 'ছোটদের গল্পমেলা' (২০২০) প্রভৃতি। কিছু উল্লেখযোগ্য কবিতা সংকলন অনিতাকে কবি হিসেবেও অন্যমাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। সেগুলির মধ্যে উলেখযোগ্য হল—'চন্দন গাছ' (১৯৮৭), 'বৃষ্টি আসবে' (১৯৯২), 'কৃতাঞ্জলি মেঘ' (২০০৮), 'কবিতা সমগ্র' (২০০৯), 'মালিম হার্বার' (২০১৫), 'আয়না মাতৃসমা' (২০১৬) প্রভৃতি। তবে সাহিত্যের যে ধারায় অনিতা অগ্নিহোত্রী শ্রেষ্ঠত্বের আসন পেয়েছেন তা হল উপন্যাস। তাঁর রচিত বহু উপন্যাসে শ্রমিক, কৃষক, মজুর শ্রেণির মানুষের জীবনযন্ত্রণার চিত্র অকপটে উঠে এসেছে। তাঁর উলেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল--- 'মহুল ডিহার দিন' (১৯৯৬), 'যারা ভালোবেসেছিল' (১৯৯৮), 'অকালবোধন' (২০০৩), 'অলীক জীবন' (২০০৬), 'সুখবাসী' (২০০৯), 'আয়নায় মানুষ নেই' (২০১৩), 'মহানদী' (২০১৫), 'কাস্তে' (২০১৯), 'মহাকান্তার' (২০২১), 'লবণাক্ত' (২০২২) প্রভৃতি।

সমাজ সচেতন শিল্পী মাত্রই গণমুখী জীবন ও চেতনাকে তুলে ধরেন। অনিতা অগ্নিহোত্রী বর্তমান সময়ের একজন নিম্নবর্গের বাস্তববাদী কথাকার; তাই তাঁর রচনায় প্রধান চরিত্র হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে শ্রমিক, মজুর ও কৃষক শ্রেণি। তাঁর রচিত বহু উপন্যাসের মতই 'লবণাক্ত' (২০২২) উপন্যাসে এই খেটে-খাওয়া চরিত্রগুলি কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে রেখেছে। এই উপন্যাসটি রচনা প্রসঙ্গে অনিতা 'ভূমিকা' অংশে বলেছেন—

> "পুরোনো গ্রাম খারাগোড়া, যা এখন আগারিয়াদের বসত, ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন আগারিয়া সমাজকর্মী অম্বুজ প্যাটেল। তাঁর কাছে আমার অশেষ ঋণ। ভেবেছিলাম, একটি প্রবন্ধ লিখব। কিন্তু সবরমতী আশ্রমে দাঁড়িয়ে মনে আসে বর্তমান ও অতীতের মেলবন্ধনে একটি উপন্যাস লেখার ভাবনা।"[২]

বাস্তবিক এ ভাবনা ঔপন্যাসিকের 'লবণাক্ত' উপন্যাসে অতীতের ব্রিটিশ ভারতের লবণ শ্রমিক ও বর্তমান সময়ের লবণ শ্রমিকদের জীবনের পট পরিবর্তনের ধারা কতখানি পরিবর্তিত হয়েছে তার একটি সম্যক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। গান্ধীজি, কস্তুরবার জীবনী গ্রন্থ, গান্ধীজির নিজের পত্রাবলী ও আনুষঙ্গিক বহু তথ্য সংগ্রহ ও পাঠ করে অনিতা লবণ শ্রমিকদের জীবন নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু ২০২০ সালের ২৬ শে জানুয়ারি সরেজমিনে গুজরাটের রণ অঞ্চলের লবণ শ্রমিকদের দুর্দশার চিত্র দেখার পর প্রবন্ধ লেখার ভাবনা থেকে সরে এসে জীবনরসের রসিক অনিতা ইতিহাস চেতনার সঙ্গে ত্রিভুবন-রাম সিং-আজাদদের জীবসংগ্রামের খুঁটিনাটি বিবরণকে 'লবণাক্ত' উপন্যাসে যথার্থ বাণীরূপ দিয়েছেন। সহানুভূতিশীল প্রশাসক ও ঔপন্যাসিক আগারিয়াদের জীবনযন্ত্রণার চিত্রকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন এবং তাদের মর্মবেদনাকে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর কথায়—

> "কেভারিয়া থেকে বেশি দূর নয় কচ্ছের ছোট রণ; রণের মানুষদের দেখতে যাই পরের দিন। রণ এখন অভয়ারণ্য। জংলি গাধাদের বংশ বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের প্রশংসনীয় উদ্যমের পাশাপাশি বহু প্রজন্মের লবণ চাষি আগারিয়াদের জীবনযাপনের সামান্যতম সুবিধাও রাখা হয়নি রণের বুকে। নিজেদের গ্রাম থেকে এখানে এসে তারা সপরিবারে বসত করে বছরে আট মাস।"[৩]

অনিতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে লবণ শ্রমিকদের বর্তমান জীবনের বাস্তব ছবি।

সমাজ কাঠামোয় ক্ষমতা ও আধিপত্যের কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষদের আমরা প্রান্তিক অ্যাখ্যা দিয়ে থাকি। এদের মধ্যে কৃষক-মজুরদের কথাই সর্বাগ্রে উঠে আসে। এ মানুষগুলি সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্গের মানুষের সুখের আচ্ছাদন তৈরি করে অথচ তারাই নিরন্তর অবহেলিত, লাঞ্ছিত। এই লাঞ্ছিত মানুষের কথাকার হয়ে একবিংশ শতকের সাহিত্যের যাত্রাপথকে মসৃণ করে চলেছেন অনিতা অগ্নিহোত্রী।তিনি বাঙালি হয়েও বাংলার বাইরের মেহনতি মানুষের জীবন-জীবিকার বাস্তব রূপ অঙ্কন করেছেন তীক্ষ্ণ লেখনী দ্বারা। ভারতের অন্যতম রাজ্য গুজরাটের কচ্ছের রণ অঞ্চল লবণ উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। এখানকার লবণ ব্রিটিশ ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে ও বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হত। রণ অঞ্চলের মানুষজন

কৃষিকাজের মতই লবণ চাষের জায়গাগুলিকে লবণ ক্ষেত হিসেবেই মনে করত। আমেদাবাদ শহরের বেশ কিছু দূরে খারাগোড়া গ্রামকেই মানুষজন লবণ ভূমির প্রবেশদ্বার মনে করত। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে মরসুমে লবণ চাষিরা এ অঞ্চলে কাজ করতে আসত। বিষ্ণুরাম, মালতী, গণেশ, উমেশরা আট মাসের জন্য লবণ ভূমিতে চলে আসে প্রতি বছর। এরা অনাহারক্লিষ্ট জীবন ত্যাগ করে কোনরকমে মাথা গোঁজার মত করে ঝুপড়িতে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে থাকে। তাদের পরিচয় তারা লবণ শ্রমিক। বর্ষার মরসুমের উপর নির্ভর করে কাজের গতি ও ধারা। কারণ বর্ষার পরেই চাষিরা লবণ চাষে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দেয় নিজেদের। ঔপন্যাসিকের ভাষায়—

> "ঘর তুলে সংসারের জিনিস গুছিয়ে নিয়ে তারপর লবণ জলের কূপ খোঁড়া। মরুভূমির কালচে পিঙ্গল বালির নিচে ঘুমিয়ে আছে লবণভরা জল। আগে খুঁজে বের করতে হয় সেই জায়গাটা যেখানে জলের স্তর খুব নিচে নয়। শক্ত মাটির গাইতি, শাবল— এসব দিয়ে খুঁড়তে খুঁড়তে একসময় জলের দেখা পাওয়া যায়।"[৪]

প্রকৃতপক্ষে রণের ভূমিতে দেখা গেছে সমুদ্রের জলের তুলনায় সমুদ্র থেকে কিছু দূরে বালিয়াড়ির তলায় যে জল তা ঢের বেশি লবণাক্ত। এই জলই লবণ তৈরির সবচেয়ে উপযুক্ত। তাই পুরুষ, নারী, শিশু, বৃদ্ধ সকলেই প্রাণপণে আট মাস যাবৎ গাইতি, শাবল তুলে নেয় লবণ চাষের জন্য। এর ফলে শ্রমিকদের জীবনে অভাব-অনটনের কিছুটা লাঘব হয়তো হয়; কিন্তু এদের প্রকৃত দারিদ্রের অবসান ঘটেনা কোনদিন। কার্তিক মাসে এদের ঘর্মাক্ত শরীর দেখলে আতঙ্কিত হতে হয়। অতিরিক্ত কায়িক শ্রমে ক্লান্ত শ্রমিকরা লবণ উৎপাদনের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলেও রণের ফাঁকা গাছপালাহীন ধূ ধূ বালিয়াড়িতে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে গ্রীষ্মের দাবদাহ অনুভব করে। এ প্রসঙ্গে 'আগুন পাখি' উপন্যাসের এ মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

> "কী ভয়ানক দিন এল! এমন খরানি বাপের জন্মে দেখেছি বলে মন হয় না। আকাশের দিকে চাইলে চোখ পুড়ে যেচে, আসমানের নীল রঙ লাল হয়ে গেয়েছে। এক-একটো দিন যেন পাহাড়ের নতুন বুকে চেপে থাকছে— কিছুতেই পেরুতে পারা যেচে না। সাথে যুদ্ধ আর আকাল।"[৫]

বিষ্ণুরাম-মালতীদের শ্রমিক জীবনে যুদ্ধের প্রভাব না থাকলেও আকালের ছত্রছায়া থেকে তারা বেরোতে পারেনি। তীব্র দাবদাহময় পরিবেশ অথচ জীবন ও জীবিকা বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে শ্রমিকদের নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। গাছ, লতাপাতাহীন মরিচিকাময় বালিয়াড়ি এই রণ অঞ্চল সরকারি খাতা-কলমে অভয়ারণ্য; এ যেন অন্ধ ছেলের নাম পদ্মলোচন। এর সত্যতা অনুধাবন করলে সাধারণ বোধশক্তি সম্পন্ন মানুষেরও গায়ে ছ্যাঁকা লাগবে।

ব্রিটিশরা এ দেশে আসার অনেক আগে থেকেই হিন্দু চুনভালিয়া কোলি সম্প্রদায়ের, মিয়ানা, সান্ধি গোষ্ঠীর আগারিয়া মুসলমানরা কয়েকশো বছর ধরে রণ অঞ্চলে লবণ চাষ করত। 'আগর' শব্দের অর্থ লবণের ক্ষেত। হয়তো এ কারণেই তাদের নাম আগারিয়া। কথিত আছে রণ অঞ্চলে সমুদ্র ছিল একদিন। সেই কারণে সেখানকার মাটির নিচের জল সমুদ্রের জলের চেয়ে প্রায় ছয় গুণ বেশি লবণাক্ত। প্রাকৃতিক কোন কারণে সমুদ্র সরে গেলেও লবণ ভূমির লবণাক্ত উপাদান নিয়ে যেতে পারেনি সমুদ্রের বারিধারা। তাই রণের বিস্তৃত ভূমির উপরিতল বালির আচ্ছাদনে ঢাকা থাকলেও মাটির নিচের জল পূর্ণ পরিমাণে লবণাক্ত। জলাভাব থাকলেও বছরের নির্দিষ্ট সময়ে অন্তর্বাহিনী নদী লুনি ও তার সঙ্গে বনস, রুপেন নদীর জলধারা রণভূমির বাসিন্দাদের কিছুটা হলেও স্বস্তি দেয়।

ব্রিটিশ আমলে কিশোর বয়সেই ত্রিভুবন আগারিয়া সংসারের দৈন্যদশা ঘোচানোর উদ্দেশ্যে লবণ ক্ষেতে কাজ করা শুরু করেছে। কিন্তু ব্রিটিশদের নির্মম লবণ কর ব্যবস্থা শ্রমিকদের দৈন্যদশা থেকে মুক্ত হতে দেয়নি। এ প্রসঙ্গে উলেখ্য যে—

> "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল তাহার ফলেই কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক বিদ্রোহ ধূমায়িত হইয়া উঠে। অত্যধিক হারে জমির উপর কর ধার্য করিবার ফলে কৃষকেরা জমি থেকে উচ্ছিন্ন হইয়া জীবিকার একমাত্র উপায় হিসেবে লুণ্ঠন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।"[৬]

বাংল ও বিহারের কৃষক বিদ্রোহের সুদূর প্রসারী প্রভাব সম্পর্কে ঐতিহাসিক লেস্টার হাচিনসনের উল্লিখিত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বলা যায়, ব্রিটিশ ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে অর্থ লুণ্ঠনের মত নিকৃষ্ট কর্ম পদ্ধতির দ্বারাই। কৃষকদের মত জীবন-জীবিকার জন্য লুণ্ঠন পদ্ধতি অবলম্বন না করলেও কর ব্যবস্থা বা রাজস্ব ব্যবস্থার অপপ্রয়োগে দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকদের

মতই লবণ শ্রমিকদের জীবনে অনটনের বিভীষিকা গ্রাস করেছে। তাই ত্রিভুবনরা কৃষকদের মতই অধিকার আদায়ের জন্য গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সামিল হয়েছে।

'নমক সত্যাগ্রহ'-এর স্বপ্ন কল্পনা করেছিলেন গান্ধীজি। স্ত্রী কস্তুরবাও এই বিষয়টি নিয়ে সমানুভূতি দেখিয়েছেন। আফ্রিকায় থাকাকালীন শ্রমিকদের জীবনযন্ত্রণার বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন বাপুজি। তিনি নিজেকে লবণের স্বাদ থেকে বঞ্চিত করলেও সাধারণ মেহনতি মানুষ এ কাজকে অনাবশ্যক মনে করে। ব্রিটিশরা রাজস্ব বৃদ্ধির মতলবে লবণ আমদানি করলেও দরিদ্র শ্রমিকদের লবণ ছাড়া এক মুহূর্তও চলেনা। তাদের খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে লবণ অপরিহার্য। এই বাস্তব সত্য আধুনিক সমাজমনস্ক কবি জয় গোস্বামীর মানসপটকেও নাড়া দিয়েছে। কবির ভাষায়—

> "আমরা তো সামান্য লোক/ আমাদের শুকনো ভাতে লবণের ব্যবস্থা হোক।"[৭]

এই অবহেলিত মানুষগুলির প্রত্যাশা খুব নগণ্য। তাই তারা সাধারণ ভাত কাপড়ের মতই ঠান্ডা ভাতে একটুখানি লবণ পেলেই খুশি। তারা উচ্চ মানের খাবার কখনোই ভোগ করতে পায়না। ফলে ব্রিটিশরা নির্বিচারে লবণ কর ব্যবস্থা চালু করলেও শোষিত এই মানুষগুলির কিছুই করার থাকে না। অথচ তাদের পরিশ্রমেই শুধুমাত্র ব্রিটিশ সরকার নয়; সমস্ত যুগেই শাসককুল আর্থিক দিক দিয়ে পরিপুষ্টতা লাভ করে। অনিতার লেখনীতে—

> "আগারিয়ারা দেশের জন্য লবণ বানায়। দরকারের আশি ভাগ। সেই লবণে ট্যাক্স বসায় ব্রিটিশ। গরিবের খাদ্য সারা ভারতে লবণ-রোটি, নুন-ভাত। পানীয় জলের মতনই অপরিহার্য লবণ। তাতেও ট্যাক্স।"[৮]

এক কথায় বলা যায়, গান্ধীজি লবণ আইন প্রত্যাহারের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেও দরিদ্র না খেতে-পাওয়া মানুষগুলির জীবনযন্ত্রণার প্রকৃত সুরাহা করতে পারেননি। ব্রিটিশ রাজত্বে দশ ভাগের এক ভাগ লবণ জোগান দিত খারাগোড়া গ্রাম। ত্রিভুনের এই গ্রাম এখন নাতি আজাদের গ্রাম। বছরের আট মাস লবণ উৎপাদন হলেও বর্ষাকালে রণ অঞ্চলের স্থির জলরাশি ভয়ানক আকার ধারণ করে খারাগোড়ার মত গ্রামগুলিকে সমুদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়। একদিকে দারিদ্রতা; অপরদিকে জলের নিকটে বসবাস করেও পানীয় জলের হাহাকার দরিদ্র শ্রমিকদের দুর্দশার চরম সীমায় পৌঁছে দেয়।

গান্ধীজির নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন বা ডান্ডি অভিযান আঞ্চলিক আন্দোলন হলেও এর ব্যাপ্তি সারা ভারতবর্ষেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বাপুজি এই আন্দোলনের ধারাকে গতিদান দিলেও এর পশ্চাতে এক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন ছিল। কারণ তিনি ডান্ডি অভিযান করলেও খারাগোড়া গ্রাম, মুসলমানদের এলাকা, রাজাদের রাজত্বের এলাকায় আন্দোলনের প্রভাব সেরকরমভাবে পাওয়া যায়নি। এই রাজনৈতিক ছলচাতুরতা কিশোর ত্রিভুবন আগারিয়াদের বোঝবার বাইরে। যদিও আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকা। তারা ব্রিটিশদের আনুগত্যে কোন কাজ করতে চায়না। অনেকেই বাপুজির পরামর্শ মত সবরমতী আশ্রমে চরকার সাহায্যে সুতো কাটার কাজ নিয়ে স্বনির্ভর হতে চেয়েছে। তাই তারা গান্ধীজির অনুগামী হয়ে আন্দোলনের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে ও অত্যাচারিত হয়েছে। কিশোর ত্রিভুবনের উপর পুলিশি নির্যাতন প্রসঙ্গে উপন্যাসে অনিতা বলেছেন—

> "আহারে বাছা, এইটুকু ছেলেকে অমন করে মারে পুলিশ! তাদের কী ঘরে ছেলেপুলে নেই! ত্রিভুবনের মুখে শোনা, ক্রম বিচ্ছিন্ন, সত্যাগ্রহের নানা বৃত্তান্ত, পরিবর্তিত হয়ে ওঠে গান্ধীরই মত, স্বাধীনতা সংগ্রামের মত এক তরুণ প্রতীক পশ্চিম প্রান্তের ছোট এক লবণ গ্রামে।"[৯]

বস্তুত, শুধু ত্রিভুবন নয়; অন্যান্য শ্রমিকদের স্বদেশপ্রেম ও জীবনসংগ্রামের কাহিনিকে 'লবণাক্ত' (২০২২) উপন্যাসে অনিতা অগ্নিহোত্রী চরম বাস্তবতায় ভাষারূপ দিয়েছেন।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনের গতিপথের মাত্রা অনুধাবন করে তা প্রতিরোধ করা ব্রিটিশ সরকারের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে গান্ধীজির দেওয়া সরকার বিরোধী ভাষণে জেরবার হয়ে ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করে। আখেরে গান্ধীজির রাজনৈতিক সুবিধা করে দেয় ব্রিটিশ শাসক। ব্রিটিশ কর্মচারী উইলসন অবশ্য গান্ধীজির বিরোধিতা করলেও শ্রমিকদের যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের ছন্নছাড়া দশাকে কিছুটা হলেও সাজাতে চেয়েছিলেন। রণের বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস আজ হয়তো স্মৃতির অতল অন্ধকারে নিমজ্জিত। কিন্তু খারাগোড়ার মত কিছু গ্রামে আজাদদের জীবন চিত্র ঔপন্যাসিকের মানসপটকে নাড়া দিয়েছে। খাতা-কলমে অভয়ারণ্য এই অঞ্চলের বহু স্মৃতি বিজড়িত গ্রাম খারাগোড়া। এ সম্পর্কে অনিতার ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা—

Trisangam International Refereed Journal (tirj)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-18
Website: www.tirj.org.in, Page No.142-151

> "সেখানকার ওইসব ঔপনিবেশিক কান্ডকারখানা, ভাঙা লাইব্রেরি, চটা ওঠা ক্লাবঘর– উইলসন সাহেবের স্মৃতিসহ শ্রী ও শ্রীমতি জৈনকে তো দেখিয়েছিল আজাদ।"[১০]

উইলসন সাহেব লবণ চাষিদের সন্তান ও আগ্রহী পুরুষ-মহিলাদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে চেয়েছিলেন। মানুষের প্রবৃত্তির তাড়না ক্ষুধা নিবারণ করা। কিন্তু সঠিক সময়ে উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী না পেলে মানুষের মানসিকতা ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। ত্রিভুবনের নাতি আজাদ একবিংশ শতকের বিশের দশকেও নিজেদের দুর্দশার চিত্র উপলব্ধি করেছে এবং স্বীকার করেছে অকপটে। আজাদ বর্তমানে লবণ শ্রমিক নয়, সে একটা সরকারি ট্রাস্ট চালায়। এ কাজে অতিরিক্ত অন্তর্ভুক্তির জন্য সে নিজের গড়া স্কুলে পড়ানোর পাঠ প্রায় চুকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার জ্ঞাতি-গুষ্টিদের শ্রমিক জীবনের নির্মমতার চিত্র তার ঠাকুরদা ত্রিভুবনের সময়কার স্মৃতিকে উস্কে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বজনভূমি' উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র দেবেন মালির পিতা গজেন মালির বীরত্বগাথা স্মৃতি আমাদের চোখে ভাসে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের কথায় প্রাণবল্লভের জবানিতে–

> "বাপ এককালে জোতদার লাটদার খতম করছ্যে, ফসলের তিন ভাগা লিয়ে আন্দোলন করছিলো। জমি জোতদারের হউক আর লাটদারের হউক, ফসলের দুভাগ চাষির। এই লিয়ে কম লোক খতম হইছ্যে? কত কাছারি পুড়াইছে অর বাপটা। তবুও বাপের কথা উঠলে কী গর্ব... দেমাক!"[১১]

প্রকৃতপক্ষে আজাদের স্মৃতিচারণার মতই গজেন মালির সংগ্রামের কাহিনি ধরা পড়েছে মাস্টারমশাই প্রাণবল্লভের স্মৃতি রোমন্থনে। 'লবণাক্ত' (২০২২) উপন্যাসে দেবেন মালির ভাবনারই প্রতিফলন ঘটেছে আজাদ চরিত্র সৃষ্টির দ্যোতনায়।

অনিতা অগ্নিহোত্রী বর্তমান ও অতীত– এই দুই কালপর্বের বা প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে আজাদ ও ত্রিভুবন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। নাতি ও ঠাকুরদাকে বেশি গুরুত্ব দিলেও লেখক আজাদের পিতা রাম সিংকে বেশি প্রাধান্য দেননি। কচ্ছের রণের বিখ্যাত লবণ গ্রাম খারাগোড়া। এই গ্রামেই আজাদের তিন পুরুষের বাস। খারাগোড়া গ্রামকে ব্রিটিশরা খুব সম্মান ও সমাদর করত। কারণ অর্থ উপার্জনের একটা বড় উৎস খুঁজে পেয়েছিল এখানে। ব্রিটিশরা দুধেল গাভীর মত যত্ন করত এই লবণ গ্রামকে। এখানেই ব্রিটিশরা লবণ কারখানা গড়ে তুলে ধীরে ধীরে শ্রমিকদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে শুরু করল। ইংরেজরা ঊনিশ শতকের মাঝামাঝিতে ব্রডগেজ লাইন তৈরি করে বড় শহরের সঙ্গে খারাগোড়ার কারখানার যোগাযোগ সংযুক্ত করেছে। মানুষকে কীভাবে নিজের সুবিধামত ব্যবহার করা যায় সেই কূটবুদ্ধি সারাক্ষণ মাথায় ঘুরঘুর করত ব্যবসায়িক জাতিদের। শ্রমিকসেবার নাম করে ব্রিটিশরা ছোট ট্রেনের একটি কামরায় ডাক্তারের ব্যবস্থা করলেও প্রকৃতপক্ষে এর পশ্চাতে শ্রমিকদের দ্বারা নির্বিচারে লবণ উৎপাদনের ফন্দি লুকিয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে অনিতা অগ্নিহোত্রী বলেছেন–

> "ঢোলবাদকরাও ট্রেনে চেপে মরুভূমির লোডিং পয়েন্টে যেত। ঢোল বাজত, বাজনা শুনে গ্রীষ্মের তাপ যদি একটু কম মনে হয়, তাপে পুড়তে পুড়তে বর্ষা আসার ঠিক আগেই যারা মুখে রক্ত তুলে লবণ উঠিয়ে যাচ্ছে বেলচার ডগায়, তাদের জন্য।"[১২]

ব্রিটিশ আমলের শ্রমিকদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার কি আজ পরিবর্তন হয়েছে? এই প্রশ্ন রাজনীতিবিদদের কাছে বিতর্ক সৃষ্টি করে। স্বাধীনতার পর প্রায় দশ বছর পর্যন্ত ব্রিটিশদের পাতা লাইন ধরে ওয়াগন ভর্তি হয়ে সদরের দিকে লবণ আসত। সময়ের সাথে সাথে পরিস্থিতিও পরিবর্তিত হয়েছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে ব্রিটিশদের সল্ট ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে কালক্রমে তৈরি হয়েছে হিন্দুস্থান সল্ট ফ্যাক্টরি, ছোট-বড় লিজ পাওয়া লবণ কারিগর ও তাদের সমবায় সমিতি। বর্তমানে দেশের প্রয়োজনের প্রায় চল্লিশ শতাংশ লবণ কচ্ছের রণ থেকে উৎপন্ন হয়। আধুনিক শিল্পায়নের গতিশীলতায় কিশোর ত্রিভুবনের বয়সে অনেককেই আর লবণ ক্ষেতে কাজ করতে হয়না। যুগ পাল্টেছে, এমনকি কম বয়সি মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে, খেলাধূলায় সাফল্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ করছে। কিন্তু আগারিয়াদের একটা শ্রেণির ছেলেমেয়েদের এখনও লবণ চাষে নিযুক্ত থাকতে হয়। ব্রিটিশ আমলের পানীয় জল সরবরাহ পাইপ লাইনের অবস্থা খুব শোচনীয়। নোনা ভূমিতে তাই পানীয় জলের হাহাকার। স্বাধীন দেশের সরকারের বহু রাজনৈতিক প্রতিনিধির প্রতিশ্রুতিতেও শ্রমিকদের দুরবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। এমনকি ব্রিটিশদের দেওয়া বর্তমানে বিকল চিনামাটির পাইপ ও চৌবাচ্চা সারাতে এখনকার সরকার গড়িমসি করছে নতুন জল সরবরাহ লাইন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। উপন্যাসে বর্ণিত–

> "জলের কষ্ট; তেষ্টার জল না পাওয়ার, ভাল করে স্নান করতে না পারার কষ্ট আট মাস তাড়া করে ফেরে আগারিয়াদের। জল পাওয়ার যেটুকু আশা ছিল, ছোট রণের পুরো এলাকাটা অভয়ারণ্য ঘোষণা হওয়ার পর তা গিয়েছে। জঙ্গল বিভাগের দাপটে সুখ-শান্তি নষ্ট হতে বসেছে।"[১৩]

নামেই অভয়ারণ্য; কিন্তু এ অঞ্চলের গুটিকতক বাবলা, কাঁটা গাছের সারি, কালচে সবুজ গাছের ছড়ানো-ছেটানো মরু প্রান্তরের পাশ দিয়ে নর্মদা নদী বয়ে গেছে। অথচ জঙ্গল আইনের ঘেরাটোপে প্রশাসনের আড়ালে বঞ্চনার এক প্রত্যক্ষ ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে এ অঞ্চলে। এ বিষয়গুলি সম্পর্কে আজাদ এখন বেশ ভালই জানলেও তার কিছুই করার থাকেনা।

ডান্ডির সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রভাব শ্রমিকদের জীবনে ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ লবণ আইন প্রত্যাহারের দাবিতেই ছিল এই আন্দোলন। যেকোন আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য থাকে কোন নির্দিষ্ট দাবিদাওয়া। সত্যাগ্রহীদের সার্বজনীন উদ্দেশ্য ছিল লবণ আইন রদ ও লবণ কর ব্যবস্থার বিলুপ্তি। বাপুজির নীতি ছিল অহিংস। তাই পুলিশের অকথ্য নির্যাতন ত্রিভুবনের মত বাপুজির অনুগামীরা নির্দ্বিধায় সহ্য করেছে এবং অনেক সত্যাগ্রহী প্রাণ বিসর্জন দিতেও পিছপা হয়নি। পতঙ্গের অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দেওয়ার মত পুলিশি নির্যাতনের আগুনে তারা ঝাঁপ দিয়েছে অবলীলায়। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেছেন---

> "রাইফেলধারী পুলিশ বলছে— আর এগোলে আমরা গুলি করব। তরুণরা জামা খুলে বুক পেতে দিয়ে বলছে— কর, কর, এখানে গুলি কর; আমার দেশের জন্য আমি তৈরি! সবচেয়ে রক্তাক্ত ওই ২১ শে মে, মার খেয়ে পড়ে গিয়েছিল ত্রিভুবনও। রক্তে না, যেন জলে ভেসে যাচ্ছে শরীর।"[১৪]

তরুণ আন্দোলনকারী শ্রমিকদের ঔদ্ধত্য ও প্রতিবাদে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী দিশেহারা হয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করেছিল। ত্রিভুবনের মত আন্দোলনকারীরা রক্তে রাঙা হয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে। তবুও তারা একটিবারের জন্য ব্রিটিশ শক্তির কাছে মাথা নোয়ায়নি। এও এক স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মত্যাগের অন্যতম সোপান; যা ভারতবর্ষকে স্বাধীন হওয়ার পথে এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে।

ভৌগোলিকতার দিক দিয়ে ডান্ডি এমনই এক সমুদ্র উপকূল যেখানে সমুদ্রের ঢেউ লবণ বয়ে আনে। শ্রমিকদের গর্ত করা স্থানে জমা হয় প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট লবণ। এরকমই সমুদ্র উপকূলের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রাকৃতিক লবণের স্তূপ। এই স্তূপের অধিকার একটা সময় আগারিয়াদের দখলে থাকলেও ব্রিটিশ ভারতে এ সম্পদ ব্রিটিশরা করায়ত্ত করে ফেলে। শ্রমিকদের সম্পত্তির অধিকার হারিয়ে গেলেও কাজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়নি তারা। আগে শ্রমিকরা লবণ উৎপাদন করে নিজেরাই বিক্রি করত। কিন্তু ব্রিটিশদের অর্থলোলুপতার শিকার হয়ে ব্রিটিশদের দাসে পরিণত হয়েছে তারা। এ প্রসঙ্গে অমিতাভ রায়ের 'জোয়াই' (২০২২) আখ্যানে উল্লেখ্য—

> "কোন শিশুর গরিব মা-বাবাকে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে, প্রয়োজনে তাদের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। কখনো বা অনাথ আশ্রম বা এতিমখানার সঙ্গে শলা করে এক লপ্তে তুলে আনা হয়েছে এক ঝাঁক শিশু। অনেকে আবার পারিবারিক দারিদ্র নিরসনে বাড়ির বাচ্ছাদের মেঘালয়ে পাঠিয়েছে। চূড়ান্ত বিচারে হাজারে হাজারে শিশু-কিশোর এখানে বিভিন্নভাবে চলে আসে, যাদের শ্রমের বিনিময়ে জয়ন্তিয়া পাহাড়ের র‍্যাট-হোল মাইন থেকে বেরিয়ে আসে কালো সোনা।"[১৫]

মেঘালয়ের এই শিশু-কিশোর কয়লা শ্রমিকদের দুর্বিষহ জীবনের মতই স্বাধীনতাপূর্ব ত্রিভুবনদের জীবনে নেমে এসেছে বিপর্যয়ের বন্যা। কালের দীর্ঘ ব্যবধানেও 'লবণাক্ত' উপন্যাসে বর্তমানের শোষক-শোষিতের রূপ প্রকট হয়েছে নিষ্ঠুর বাস্তবতায়।

আজাদের বাবা রাম সিং-এর চিন্তাধারা পিতা ত্রিভুবনের চেয়ে অনেকাংশে ফারাক ছিল। রাম সিং পিতার ঠিক বিপরীত মত পোষণ করে। ত্রিভুবন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে রক্তাক্ত হয়েছে। অথচ পুত্র রাম সিং লবণ কারিগরের জীবনে বীতশ্রদ্ধ। দারিদ্রের ছত্রছায়ায় থেকে হয়তো এ উপলব্ধি। তাই সে পিতার অধিকারের লড়াইকে তাচ্ছিল্য করে, ভুল ভাবে। তার মনে হয়েছে স্বাধীন ভারতের সরকারের তুলনায় ব্রিটিশ ভারতই ভাল ছিল। নোনা ভূমিতে ব্রিটিশদের দেওয়া পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থাতে সে আস্থা ফিরে পেয়েছিল। কিন্তু তার পরবর্তীতে দারিদ্রের পুনরাবৃত্তি রাম সিং মেনে

নিতে পারেনি। পিতার জীবদ্দশাতে ঘটে যাওয়া অভিজ্ঞতা রাম সিং-এর মানসিকতাকে তিক্ত করে দিয়েছে। পিতার আত্মত্যাগ তার কাছে নগণ্য এক প্রাপ্তি। অনিতা অগ্নিহোত্রীর কথায়—

> "ত্রিভুবনের জীবদ্দশাতেই আগারিয়াদের নিজেদের পয়সায় ট্যাঙ্কারের জল কিনে খেতে দেখল সে। তবুও ত্রিভুবনের গভীর আস্থা দেশের স্বাধীনতার উপর, স্বাধীন দেশের নির্বাচিত সরকারের উপর। নিজের রক্ত দিয়ে অর্জন করেছে এই স্বাধীনতার খুব ছোট একটা অংশ, হয়তো নুনের একটা দানার মতো ছোট, তবুও তো।"[১৬]

স্বাধীন সরকারের ওপর ত্রিভুবনের আস্থা থাকলেও তার আত্মত্যাগের পরিণামকে সরকার গুরুত্ব দেয়নি। দারিদ্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারেনি ছেলে রাম সিং। কোথাও যেন শোষক-শোষিতের নির্মম সম্পর্কের ছ্যাঁকা অনুভব করেছে রাম সিং। তাই সে পিতার ভাবনা থেকে সরে এসে নিজের ধারণা প্রতিষ্ঠা করেছে।

এতো লড়াই, এতো আন্দোলন সত্ত্বেও ত্রিভুবনরা পরের প্রজন্মকে প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে পারেনি। গান্ধীজি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অগ্রদূত হলেও আগারিয়াদের দৈন্যদশা নির্মূলের ব্যাপারে অনেকটাই নিষ্ক্রিয় ছিলেন। ত্রিভুনদের উৎপাদিত লবণ ব্যবসায়ীরা কম দামে কিনে অধিক মুনাফা লাভের ফলে দারিদ্র আগারিয়াদের জীবনে নিত্য দিনের সঙ্গী হয়ে থেকেছে। গান্ধীজির সঙ্গে আরউইনের ঐতিহাসিক চুক্তিও এ সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। এমনকি শ্রমিকদের উপর পুলিশি নির্যাতনের প্রসঙ্গও গান্ধীজি এ চুক্তিতে উত্থাপন করেননি। এই মর্মস্পর্শী বিষয়টি গরিব, দেশপ্রেমিক, লবণ শ্রমিক ত্রিভুবনের হৃদয়কোঠরে আঘাত করেছে। সে বাপুজির এই অপ্রত্যাশিত আচরণে হতাশ হয়েছে এবং সূক্ষ্ম অভিমানে নিজেকে বিদ্ধ করেছে। উইলসনকে আমরা যতই বইপোকা অ্যাখ্যা দিই না কেন, উইলসনের মত বহু ব্রিটিশ কর্মচারীকে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের মগজ ধোলাই করার কাজে ব্যবহার করেছে। অনিতার কথায়—

> "ত্রিভুবন বেঁচে থাকতেই দেখে গিয়েছে খারাগোড়া গ্রামের বদল ও ক্ষয়। দেখেছে কীভাবে একশো বছর আগে তৈরি আগারিয়াদের সুবিধার জন্য তৈরি সম্পত্তিগুলিকে আর সংস্কার করতে রাজি হল না স্বাধীন দেশের সরকার। পাঁচের দশকের ভিতরেই চলে গেল কাঠের ওয়াগন, ইঞ্জিন। তারপর ভাঙতে আরম্ভ হল ব্রিটিশের তৈরি চিনামাটির জল বাহিত নালিকাগুলি। সেগুলিও মেরামত হলনা।"[১৭]

প্রচলিত কথায় যাকে বলে 'আই ওয়াশ', সেই রীতিকে সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছে ব্রিটিশ সরকার। খারাগোড়ার সুসজ্জিত লাইব্রেরি, ক্লাবঘর, হাসপাতাল সবকিছুই গড়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকসেবার নামে প্রভূত অর্থ উপার্জন। আধুনিকতার নামে এই সস্তা রাজনৈতিক কূটকৌশলে ব্রিটিশদের ঐশ্বর্য ও স্থায়ীত্ব বাড়লেও লবণ কর প্রত্যাহারের কোন ভ্রূক্ষেপ তাদের ছিলনা। একদিকে শ্রমিকদের উৎপাদিত লবণের দাম কমছে; অপরদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া; এই অবস্থায় শ্রমিকরা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। তৎকালীন বিশ্ব পুঁজিবাদের সর্বগ্রাসী আগ্রাসন যেমন লবণ শ্রমিকদের সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্যুত করেছে; তেমনি আবার একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেও বিশ্বায়নের ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রণ অঞ্চলের শ্রমিকরা অজান্তেই শোষণযন্ত্রে পিষ্ট হয়ে নির্যাতিত, নিপীড়িত শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে।

সর্বোপরি বলা যায়, পৃথিবীর যেকোন মানুষের কাছে তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাদের বৃত্তি বা পেশা। কারণ এই বৃত্তিই অনেকাংশে নির্ধারণ করে দেয় তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কেমনভাবে অতিবাহিত হবে। তাই বৃত্তিগত সুস্থিতি প্রতিটি মানব সত্তারই প্রধান প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশা নিয়ে মানুষ বাঁচে ও বাঁচার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ত্রিভুবন-রাম সিং-আজাদদের বংশ পরম্পরায় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। অনেকক্ষেত্রেই এই শ্রেণির মানুষরা যুগে যুগে নিজেদের অধিকার দাবি ও রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ছদ্মবেশী পুঁজিবাদীর নিষ্ঠুর দমননীতির কাছে মাথা নত করে থাকতে বাধ্য হয়েছে অনন্তকাল ধরে। এই দমননীতি আসলে কর্তৃত্ব, আধিপত্য ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানেও রাজনীতির ছদ্মবেশটা সদাসর্বদা আগ্রাসনের পথে হেঁটে চলেছে। রাজনীতির ছত্রছায়ায় রাষ্ট্রক্ষমতা প্রান্তিক মানুষের স্বাধিকারকে কোন কালেই স্বেচ্ছায় মেনে নিতে চায়না। বিশ্বায়ন ও শিল্পায়নের আগ্রাসনে লবণ ভূমির শ্রমিকদের জীবনযন্ত্রণার নোনা অশ্রুধারা আজও ঝরে চলেছে। অথচ বিশ্বায়ন ও শিল্পায়নের চাকাকে গতিশীল করে রেখেছে আগারিয়াদের মত বহু নিরন্ন মানুষ। অনেক কষ্ট, অনেক যন্ত্রণার মধ্যে থেকেও এই দরিদ্র মানুষগুলি স্বপ্ন দেখেছে সুন্দরভাবে বাঁচার। কিন্তু সমাজকাঠামোর মূল কারিগরদের স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গেছে বিশ্বায়নের প্রস্তরাঘাতে। বাস্তববাদী, সমাজসচেতন, প্রান্তিক মানুষের যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের রূপকার অনিতা অগ্নিহোত্রী 'লবণাক্ত' (২০২২)

উপন্যাসে শাসকের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত এই প্রান্তিক লবণ শ্রমিকদের জীবনযন্ত্রণার চিত্রকে নির্মম বাস্তবতায় সাহিত্যরূপ দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১. দাশ, ডঃ নির্মল, 'চর্যাগীতি পরিক্রমা', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দশম সংস্করণঃ ডিসেম্বর ২০১৪, অগ্রহায়ণ ১৪২১, পৃ. ২০০
২. অগ্নিহোত্রী, অনিতা, 'লবণাক্ত', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ফাল্গুন ১৪২৮, পৃ. ৮
৩. তদেব, পৃ. ৭
৪. তদেব, পৃ. ১০
৫. হক, হাসান আজিজুল, 'আগুন পাখি', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণঃ মে ২০০৮, জ্যেষ্ঠ ১৪১৫, পৃ. ১৫৭
৬. রায়, সুপ্রকাশ, 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা- ৯, প্রথম র‍্যাডিক্যাল সংস্করণঃ জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ২৫
৭. মজুমদার, অভীক, 'সাহিত্যচর্চা', 'উচ্চমাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য সংকলন', পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৭
৮. অগ্নিহোত্রী, অনিতা, 'লবণাক্ত', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ফাল্গুন ১৪২৮, পৃ. ৫৩
৯. তদেব, পৃ. ৭০
১০. তদেব, পৃ. ৮৫
১১. চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, 'স্বজনভূমি', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, পুনমুদ্রণঃ জুন ২০১৬, আষাঢ় ১৪২৩, পৃ. ১৫
১২. অগ্নিহোত্রী, অনিতা, 'লবণাক্ত', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ফাল্গুন ১৪২৮, পৃ. ৩২
১৩. তদেব, পৃ. ৩৭
১৪. তদেব, পৃ. ১১৬
১৫. রায়, অমিতাভ, 'জোয়াই', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশঃ এপ্রিল ২০২২, বৈশাখ ১৪২৯, পৃ. ৯০
১৬. অগ্নিহোত্রী, অনিতা, 'লবণাক্ত', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ফাল্গুন ১৪২৮, পৃ. ১১৯
১৭. তদেব, পৃ. ১১৯

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা :

১. ভদ্র গৌতম, চট্টোপাধ্যায় পার্থ সম্পাদিত, 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ২৬, দশম মুদ্রণঃ ফেব্রুয়ারি ২০২২
২. সেনমজজুমদার, জহর, 'নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন', পুস্তক বিপণি, কলকাতা- ৯, দ্বিতীয় মুদ্রণঃ এপ্রিল ২০১৭
৩. দেবসেন, সুবোধ, 'বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্য সমাজ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা- ৯, দ্বিতীয় সংস্করণঃ ১৪ এপ্রিল ২০১২, ১লা বৈশাখ ১৪১৯
৪. মন্ডল, রাকেশ, 'সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাসে মানুষের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম', সমকালের জীয়নকাঠি প্রকাশন, জীবন মন্ডল হাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, প্রথম প্রকাশঃ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১